বেলা অবেলার কথা

খাদ্য সমস্যা সমাধানে ব্রি: এখন কোথায়, গন্তব্য কতদূর

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

গ্লোবাল- ওয়ার্মিং নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের জন্য যে বেশ নাজুক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ নিয়ে দেশি বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্নতার শেষ নেই। তারা গবেষণা করছেন। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার বসাক কৃত আমাদের পরিম- লে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি উপাত্তধারার আমার হাতে আছে। ধারাটি পরিষ্কার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ গবেষণাটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ববাহী। কারণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে করা একজন তরুণ বিজ্ঞানীর নিজস্ব কাজ ছিল এটি। ঘটনাক্রমে কাজটির সঙ্গে আমার কিছুটা সংশ্লিষ্টতা ছিল। আমাদের তাপমাত্রা বাড়ছে। বৃষ্টিপাতের অবস্থাও তাই। অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত দুই- ই বাড়ছে। তবে শীতে তাপমাত্রা সময় বিশেষে কিছুটা নেমে যাওয়ার প্রমাণ আছে। তাই বলা যায়, তাপমাত্রা কিছুটা চরম ভাবাপন্ন হওয়ার পথে। অর্থাৎ শীতে বেশি শীত এবং গরমে বেশি গরম। এখানে বলা হয়েছে ধানের ফলন ২০৭০ নাগাদ প্রায় ৫০% কমে যেতে পারে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এ গবেষণায় জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি নেই। আমার কাছেও ২০৭০ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো উপাত্ত নেই। তবে এ কথা বলা যায় যে, তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২৫ কোটির কম হবে না। অথচ ধানের ফলন কমে যাবে। পাশাপাশি আমাদের খাবারের মোট চাহিদা বেড়ে যাবে। তখন আমরা খাবো কী?

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প নেই। আমরা ভাত খেয়ে বেঁচে থাকি। আমাদের জন্য ধানই সমৃদ্ধি। এজন্য ধান নিয়ে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং যেখানে আছে সেখান থেকে কোন ক্রমেই ধানের ফলন কমতে দেয়া যাবে না। সে জন্য ধান নিয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে। গবেষণায় নতুন ধারার প্রবর্তন করতে হবে।

ধান গবেষণা এখন যে পর্যায়ে আছে তাকে খুব একটা খারাপ বলা যায় না। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে আধুনিক ধান গবেষণার শুরু হয়। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটির কিছু বেশি। চালের উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন। এখন জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। চালের উৎপাদন সাড়ে তিন কোটি টনের বেশি হয়ে গেছে। দেশে এখন ভাতের অভাব নেই। এসবই সম্ভব হয়েছে আধুনিক ধান- বিজ্ঞান, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কৃষকের পরিশ্রম; এ তিনের যথাযথ পারস্পরিক বোঝাপড়ার কারণে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ৪টি হাইব্রিডসহ ৭২টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। ভাতের অভাব পূরণে ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক জাতগুলোর ভূমিকা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোরো ধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হলো ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৫, ব্রি ধান৫৮, ব্রি

ধান৫৯, ব্রি ধান৬০, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৩। বোরো ধান সেচনির্ভর। উৎপাদনের জন্য প্রচুর পানি সেচ দিতে হয়। এ পানির সিংহভাগ অংশ আসে মাটির নিচ থেকে। ফলে পানির ভূগর্ভস্থ স্তর দিনকে দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি চলতে দেয়া হলে যে কোন ধরনের একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। অথচ দেশের প্রায় ৫ মিলিয়ন হেক্টর বোরোর জমি থেকে মোট চালের উৎপাদন আসে ১৮.৭৮ মিলিয়ন টন। বোরোর আবাদি আওতা মোট ধানী জমির ৪২ শতাংশ হলেও উৎপাদনের পরিমাণ ৫৬ শতাংশ। পাশাপাশি আমনের অবদান ৫.৬২ মিলিয়ন হেক্টর জমি থেকে মোট উৎপাদনের ৩৮ শতাংশ। আমনের অধীনে উৎপাদিত চালের পরিমাণ ১২.৯০ মিলিয়ন টন। এখানে জলি আমনের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যাহোক অতীতে পরিবেশবান্ধব আউশ ধানের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকলেও আজ আর তেমন নেই। দেশে এখন মাত্র ১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে। মোট ধানী জমির ৬ শতাংশ মাত্র। এ থেকে উৎপাদিত চালের পরিমাণ মোট উৎপাদিত চালের মাত্র ৯ শতাংশ। অথচ এমন সময় ছিল যখন বোরো ছিল নিতান্তই সীমিত এলাকার জন্য। আউশ ছিল রোপা আমনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফসল।

বলা যায়, সেচনির্ভর বোরো ধান উদ্ভাবনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। এক সময় বোরোর জাত উদ্ভাবন করা হতো শুধুমাত্র সেচনির্ভর অনুকূল পরিবেশের কথা মাথায় রেখে। এখন এ ধরনের পরিবেশের আওতা কমে আসছে। তাই তথাকথিত অনুকূল পরিবেশের ধান বোরো নিজেই কিছুটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে গেছে। তবে বৈরী পরিবেশে অভিযোজন উপযোগী বোরোর জাত উদ্ভাবনের কাজ পিছিয়ে নেই। দেশের উপকূলীয় এলাকার জন্য লবণসহনশীল বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি ধান৬৭ মোটামুটি লবণসহনশীল। ব্রি ধান৬৭ লবণসহনশীল এবং ধান দেখতে ব্রি ধান২৮- এর মতো। বোরোর জন্য পানি সাশ্রয়ী জাত বা আবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা পরিমার্জনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে অডউ সেচ- প্রযুক্তির প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে। পাশাপাশি রোপা আমনের ব্যাপারে অগ্রগতি কম হয়েছে বলা যাবে না। তবে মৌসুমের কারণে ফলন বোরো থেকে কিছুটা কম। তাই বোরোর তুলনায় আবাদি এলাকা কিছুটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মোট উৎপাদন কিছুটা কম। আমন বৃষ্টিনির্ভর ফসল। স্বাভাবিকভাবে আষাঢ়- শ্রাবণে বৃষ্টি হয়। তখন এ ধান রোপা করা হয়। পরে বৃষ্টি হলে রোপা আমনের তেমন অসুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে খরা দেখা দিলে সমস্যা। এমনকি আষাঢ়- শ্রাবণেও খরা হচ্ছে ইদানীং। এ সময় কিছুটা সম্পূরক সেচ দিলে ধানের পক্ষে সুবিধা। বেশির ভাগ সময় আশ্বিন- কার্তিকে ধানে থোড় আসার সময় খরা পড়তে পারে। আষাঢ়- শ্রাবণে রোপা করার পর অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধান ডুবে যেতে পারে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক উফশী জাতগুলো টিকতে পারে না। এসব বৈরী অবস্থা মাথায় রেখে বেশ কিছু ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন ব্রি ধান৫১ এবং ব্রি ধান৫২ কিছুটা ঘোলা পানির নিচে দুই সপ্তাহ ডুবে থাকলেও টিকে থাকতে পারে। ব্রি ধান৫৬ এবং ব্রি ধান৫৭ প্রজনন পর্যায়ের খরা কিছুটা হলেও হয় সহ্য করতে পারে অথবা পরিহার করতে পারে। রোপা আমন মৌসুমে উপকূলীয় এলাকার কোথাও কোথাও লবণাক্ততা সমস্যা হতে পারে। এজন্য ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১ প্রথমে ছাড় করা হয়। এগুলোর জীবনকাল কিছুটা বেশি হওয়ায় চাষিদের মধ্যে কিছুটা আগ্রহের কমতি ছিল। পরে স্বল্প জীবনকালীন দুটি জাত ব্রি ধান৫৩

এবং ব্রি ধান৫৪ চাষিদের দেয়া হয়। জাতদুটো ভালো করছে। পুষ্টিগুণে ভরপুর কিছুজাত ইতিমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। জিঙ্কসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৪ এদের মধ্যে অন্যতম। ব্রি ধান৬২ সারাবিশ্বে প্রথম জিঙ্কসমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল ধান। জাতটির আরও কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন রোপা আমনের সবচেয়ে কম সময়ের ধান। মাত্র ১০০ দিনে ধান ঘরে আসে এবং হেক্টরে দিন প্রতি সর্বোচ্চ (৫০ কেজি) ফলনের অধিকারী। রোপা আমনের জন্য প্রযোজ্য ব্রি ধান৬৬ সর্বোচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধানের জাত। ব্রি ধান১৬ এবং ব্রি ধান২৫ ডায়বেটিক রোগীদের উপযোগী ধান। ব্রি ধান৩১ এঅইঅ (এধসধ ধসরহড় নবঃধ নঁঃবৎরপ ধপরফ) সমৃদ্ধ যা মানসিক অবসাদগ্রস্তদের চিকিৎসায় কাজে লাগে। ব্রির বেশকিছু জাত রপ্তানিযোগ্য-প্রাইম কোয়ালিটি গুণসম্পন্ন। যেমন ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি) এবং ব্রি ধান৬৩ (সরু বালাম)।

আমন এবং বোরোর জন্য ভালো কিছু করা গেলেও আউশ মৌসুমের জন্য আশাপ্রদ কিছু করা যায়নি। যদিও বৃষ্টিনির্ভর বোনা আউশের কয়েকটি ভালো জাত আমাদের হাতে আছে। যেমন ব্রি ধান২১, ব্রি ধান২৪, ব্রি ধান৪২ এবং ব্রি ধান৪৩। তবে আউশ বলতে যা বোঝায় এ জাতগুলোকে সেভাবে বিশেষায়িত করা ঠিক না। তবুও জাতগুলো মোটামুটি খরা সহনশীল। শুধুমাত্র রোপা আউশ হিসেবে উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো বিআর২৬, ব্রি ধান২৭ এবং ব্রি ৪৮। সম্প্রতি ব্রি ধান৬৫ নামে বোনা আউশের আরেকটি জাত ছাড় করা হয়েছে। আউশ পরিবেশবান্ধব ফসল। বৃষ্টিনির্ভর বলে এবং বোনা আউশে সেচের দরকার হয় না বলে পানি সংরক্ষণে আউশ ধান একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আবহাওয়াগত কারণে আউশ কিছুটা কম ফলন দেয় বলে আমরা এ ফসলটির প্রতি সুবিচার করা হয়নি। এক সময়ের সংশ্লিষ্ট মহলের দূরদর্শিতার অভাবও ছিল বলা যায়। তাই আউশের গবেষণা খুব একটা এগুতে পারেনি। একই কথা প্রযোজ্য জলি আমন ধানের বেলায়ও।

অনেকের ধারণা একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করলেই হয়ে গেল। অথচ উচ্চ ফলনশীল যে কোনো ধানের জাত 'যথাযথ পরিচর্যা' ছাড়া ভালো করতে পারে না। একটি জাত উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই জাতসংশ্লিষ্ট কৃষিতাত্ত্বিক ও বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও উদ্ভাবন করতে হয়। দুঃখের বিষয় জাত উদ্ভাবনের বিষয়টি যতটা গুরুত্ব পায় অন্য বিষয়গুলো ততটা গুরুত্ব পায় না। তবে পরিচর্যার বিষয়গুলো প্রযুক্তি হিসাবে বিবেচিত না হয়ে যখন উপকরণ (সার- বীজ এবং কীটনাশক) হিসেবে বিবেচিত হয় তখন বেশ গুরুত্ব পায়। যেমন সারের মূলহ্রাস বা ভর্তুকি, বালাইনাশকের বিশুদ্ধতা, ভালো বীজের প্রাপ্যতা ইত্যাদি।

সেচনির্ভর আবাদ কার্যক্রমের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যাবে। কৃষি কাজ এবং ধান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। এজন্য ধীরে ধীরে বোরোর আবাদি এলাকা কমিয়ে ফেলার দরকার। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে দেশের প্রায় আঠারো শতাংশ জমি পানির নিচে ডুবে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জলি আমনের এলাকা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সাগর থেকে লোনা পানি ভেতরে বহুদূর পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করবে। অসময়ে তাপমাত্রার খেয়ালি আচরণ, সময়ের আগে বর্ষার পানি নেমে যাওয়া বা অসময়ে পাহাড় থেকে আকস্মিক বন্যার পানি নেমে আসা, অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়া এবং সময়ের বৃষ্টি সময়ে না হওয়া সহ অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য ধানের ফসল বিন্যাসে পরিবর্তন

আনার প্রয়োজনে যা করা দরকার তাহলো- বোরো ধানের চারা এবং প্রজনন পর্যায়ে ঠা- া সহনশীল করার জন্য গবেষণা জোরদার করা। পরিবেশবান্ধব আউশ ধানের আবাদ বাড়ানোর তাগিদে খরা প্রতিরোধী এবং প্রজনন পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য কাজ করা। যথাযথ জোয়ার- ভাটা সহনশীল জাত বের করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। বন্যা বা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হওয়া বা অবিরত জলাবদ্ধ পরিবেশের জন্য রোপা আমন ধানের জাত উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখা। খরা- সহনশীল রোপা আমনের জাত উদ্ভাবনের কাজ জোরদার করা। জলি আমন ধান নিয়ে নতুন করে চিন্তা করা। শুধুমাত্র অল্প পানির জলি আমন ধানের চিন্তা না করে বেশ গভীর পানির জলি আমন ধান নিয়ে নতুন উদ্যোমে কাজ করা। লবণাক্ত এলাকার জন্য আরও ভালো লবণ সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য কাজ করা। স্বল্পমেয়াদি এবং উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য বিশেষ কার্যক্রম নেয়া। অধিকতর সা েলোকসংশ্লেষণে সক্ষম বেশি ফলনের উপযোগী সি- ৪ (ঈ৪) ধানের জাত বের করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া। বায়োলজিক্যালি নাইট্রোজেন ফিঙ্ করতে পারে এমন ধরনের জাত বের করার জন্য কাজ করা। পরিবেশবান্ধব এবং অধিকতর বৈরী পরিবেশ সহনশীল ট্রানজেনিক ধানের জাত বের করার চেষ্টা করা। চৎবৎবহহরধষ এবং ঋধপঁষঃধঃরাব স্বভাবের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করা। বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজের প্রি এবং পোস্ট- হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণাও জোরদার করা।

পীড়ন- প্রতিরোধী হাইব্রিড ধান তৈরির গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিশেষ কার্যক্রমও জরুরি। অর্গানিক রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে ধানের জমির সার ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের জন্য কাজ করা দরকার। পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনও জরুরি। এজন্য সার্থক জীবতাত্ত্বিক বালাই ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন আবশ্যক। একই সঙ্গে ধানের আবাদ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে মিথেন নির্গমন কমিয়ে ফেলার পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পরিচর্যার মাধ্যমে নাইট্রাস অঙ্াইড জাতীয় গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা দরকার। ওহঃবমৎধঃবফ সরপৎড়- ভধৎসরহম ংুংঃবস প্রান্তিক চাষিদের জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা হতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা হওয়া দরকার। চৎবপরংরড়হ ধমৎরপঁষঃঁৎব ংুংঃবস চালু করার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে সেটাও এখন ভেবে রাখা দরকার।

পানির পরিমিত ব্যবহার, লবণাক্ত এলাকায় ধান চাষের জন্য লাগসই সেচ ব্যবস্থা উদ্ভাবনে জোর দেয়া উচিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সংরক্ষেণের জন্য যথাযথ কার্যক্রম থাকা দরকার। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য আমাদের চাষিদের অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বয় করা যায় এমন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। ধানভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা, ধান- আবাদকে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা, কৃষি বীমা চালু করা নিয়ে যুগোপযোগী গবেষণা করা।

প্রত্যেকটি অমৎড় উপড়ষড়মরপধষ তড়হব- এর জবঢ়ৎবংবহঃধঃরাব স্থানসমূহে একটি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এ অবকাঠামোগুলোতে শুধু দিন ও রাত্রির নয়, প্রতি ঘণ্টায় বায়ুপ্রবাহসহ বিভিন্ন আবহাওয়া

উপাত্তের চলমান পরিবর্তিত অবস্থা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে অঞ্চলভেদে বৈরী পরিবেশের (চরম তাপমাত্রা, ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি, গরম বাতাস) কারণে ধানফসলে (অন্যান্য ফসল ও কৃষি কমোডিটিসহ) যেসব সংকট অবস্থা তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে গবেষণা ও প্রতিবিধানের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সহজতর হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অধিদফতরসমূহ এক যোগে কাজ করতে পারে।

বৈরী পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে এমন ধরনের জাত এবং পরিচর্যা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিবেশে অবস্থান করে গবেষণা করা যায় এমন অবকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। বৈরী অবস্থার কারণে ধান- ফসলের যে ক্ষতি হয় সে বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহের সরাসরি কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে উপগ্রহভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত জনবল ও গবেষণা অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গবেষণার সবক্ষেত্রে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সমন্বিত এবং আধুনিক গবেষণার খাতিরে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মলিকুলার ল্যাব গড়ে তুলা জরুরি। তাহলে যে কোন পটভূমির একজন বিজ্ঞানী তার গবেষণার কাজে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমপৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। বর্ধিত গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন কার্বন- ডাই অঙ্াইড, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা আমাদের ধানের ফলন ও শারীরতাত্ত্বিক প্রপঞ্চসমূহের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ফাইটোট্রনসহ আনুসঙ্গিক সুবিধাদি থাকা আবশ্যক।

ব্রি এখন সেচনির্ভর থেকে বৃষ্টিনির্ভর বা পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবনের কাজে হাত দিয়েছে। এজন্য চার দশক ধরে বোরোর কাছে আউশের হারানো জমি কিভাবে উদ্ধার করা যায়, কতদিনে কতখানি উদ্ধার যায় এবং কতখানি উদ্ধার করলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তা নিয়ে কিছু চিন্তা- ভাবনা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। ব্রির হিসাব অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন ঠিক রেখে বোরো চাষের ২০% (প্রায় ০.৯ মিলিয়ন টন হেক্টর) জমি আউশ আবাদে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। এ কারণে আউশের বিদ্যমান আবাদি এলাকাসহ মোট ১.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি আউশ আবাদ করতে হবে। এজন্য আউশ থেকে ধানের মোট উৎপাদন আসতে হবে ৭.৩ মিলিয়ন টন এবং আউশের ফলন হতে হবে ধানের হিসেবে হেক্টরপ্রতি ৪.০ টন। বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক সিমুলেশন ফলাফল (ঝরসঁষধঃরড়হ ংঃঁফু) অনুযায়ী, আউশ মৌসুমে প্রস্তাবিত ধানের ফলন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে প্রয়োজনীয় মজুদ রেখে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১.৬ মিলিয়ন টন চাল (চালকে ১.৪২ দিয়ে পূরণ করলে ধানের হিসাব পাওয়া যায়) বিশ্ববাজারে রপ্তানি করা যাবে। আর এ ফলন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত, ধান উৎপাদন কৌশলের উপযুক্ত সমন্বয় এবং সর্বোপরি সময় বুঝে সাশ্রয়ী এবং সমপূরক সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশে অন্যান্য জমিসহ চাষযোগ্য পতিত জমি আবাদের আওতায় এনে সর্বমোট প্রায় ৪.০ মিলিয়ন হেক্টর জমি আউশ ধানের আওতায় আনা যায়। উফশী ও হাইব্রিড দ্বারা স্থানীয় জাত প্রতিস্থাপন করেও আউশ এবং আমনের উৎপাদন বাড়ানো যায়। আউশ ও আমন মৌসুমে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহের মধ্যে খরা,

আগাম বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বীজের সুপ্ততা, লবণাক্ততা, আগাছা, রোগবালাই, পোকামাকড় ইত্যাদি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। সময়মতো আউশ ধান লাগানো এবং নির্বিঘ্নে ফসল কাটার জন্য উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারও খুব গুরত্বপূর্ণ। কৃষকদের সার, বীজ বা কীটনাশকের জন্য প্রণোদনা ও শস্যবীমার মাধ্যমেও আউশ এবং আমন চাষে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

ভাতের থালার দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে থালার অধিকাংশ জায়গাজুড়ে ভাত। যে যাই বলুক এটাই বাস্তবতা। আমরা চাইলেও নিকট ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারব না। ফসলওয়ারি আবাদি জমির ভাগ দেখলেও একই চিত্র ফুটে উঠে। ধানের আবাদি আওতা ৮১ শতাংশ বা তারও বেশি। উৎপাদনের বিচারে এ পরিমাণ দাঁড়াবে ৯০ শতাংশের বেশি। অতএব ধানের অবস্থান অন্যান্য ফসলের তুলনায় সবার আগে। গবেষণার অবকাঠামো যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তুলনায় ধান গবেষণা কয়েকগুণ ছোট। ব্রিতে গবেষকের সংখ্যা অনধিক ২০০। কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি (শ্রমিক বাদ দিয়ে) ৬০০'র বেশি হবে না। জনবলের বিচারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণার ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ উদ্যান উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের সমকক্ষ প্রায়। কেন্দ্রটি মাত্র ৩% জায়গা জুড়ে থাকে এমন ফসল (সবজি) নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জনবল ব্রি থেকে কম হবে নিঃসন্দেহে। ব্রি তার সীমিত জনসম্পদ নিয়ে কাজ শুরু করেছিল ১৯৭০- এ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ব্রির জনবলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি এবং এ জনবল দিয়েই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার মতো কিছু কাজ করতে পেরেছে। এখন প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। দেশ আজ অযাচিত অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিদ্যমান জনবল, গবেষণা অবকাঠামো এবং সুযোগ- সুবিধাদি এখন যথেষ্ট নয়। সবাই বলছে ব্রির গবেষণাপরিধি বাড়াতে হবে। এজন্য জনবল ও অবকাঠামো বৃদ্ধিতে অবশ্যই ব্রির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

আমাদের মতো দেশে কৃষি গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ১%। উন্নত দেশে এই পরিমাণ ৩% পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। তুলনামূলক বিচারে আমাদের এ বরাদ্দ যথেষ্ট কিনা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। এ ছাড়াও আমাদের কৃষি গবেষণার জন্য এন্ডারমেন্ট ফান্ড আছে। আমার মনে হয়, সব মিলিয়ে ভালোই বলতে হবে। শুধুমাত্র ধান গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি। বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে ব্রির জন্য মোট বরাদ্দের দু'গুণের কাছাকাছি হবে। এভাবেই ব্রি চলছে এবং চলবে। ব্রি সম্পূর্ণভাবেই সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকার যেটা ভালো বোঝেন ব্রি সেভাবেই কাজ করবে। গবেষকদেরও বিষয়টি মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]